প্রবীণ নারীর যাপন : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

হাসান আলী

আপনার মায়ের সেবাযত্ন ও দেখাশোনা কে করেন?

মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক চিরদিনের। প্রত্যেকেই মাকে ভালোবাসেন। এমন একটি বাক্য আমরা সবাই বিশ্বাস করি। মাকে কতটুকু ভালোবাসি এ নিয়ে যদিও প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ মাকে আপনি কেমন ভালোবাসেন এ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে এ প্রশ্নটি বারবার আসে। আমি যখন কোনো বিখ্যাত ক্ষমতাবান মানুষকে দেখি, তখনই জানতে ইচ্ছা করে, তার মা কার সঙ্গে থাকেন? এ প্রশ্নটি সরাসরি জিজ্ঞেস করা অসৌজন্যমূলক। তাই আমি ড্রাইভার, দারোয়ান, পিয়নকে জিজ্ঞেস করি স্যারের মা কোথায় থাকেন? তারা আমাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই ধরনের উত্তর দেন, স্যারের মা বাড়িতে থাকেন। অর্থাৎ স্যারের মা স্যারের বাসায় থাকেন না। আরেকটু গভীরে খোঁজ নিলে জানা যায়, স্যারের মা অন্য সন্তানের সঙ্গে থাকেন।

আমাদের সমাজে ক্ষমতাবান ‘স্যার’ মাঝে মধ্যে মাকে নিয়ে গল্প করেন। আবেগপূর্ণ স্মৃতিচারণ করেন। আক্ষেপ করে বলেন, ‘মাকে নিজের কাছে রাখার অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি থাকতে চান না। তার নাকি ভালো লাগে না। আসলে মার মন টেকে না।’ এসব কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এমন অবস্থা হয়? যারা সামর্থ্যবান, তারা কেন মায়ের সেবাযত্ন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন? চাকরিবাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, মাকে পাশে নিয়ে দুপুর কিংবা রাতের খাবার খাওয়ার সময় হয় না।

গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় নারী দীর্ঘায়ু হন। বৃদ্ধ নারীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারীদের প্রায় সবাই বিধবা। ৬০ বছর বয়সী নারীর অর্ধেকই বিধবা। এ বিধবাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আবার বিয়ে করেন। আমাদের সমাজ বৃদ্ধের বিয়ে মেনে নিলেও বৃদ্ধার বিয়ে মানতে পারে না। বিধবা নারী প্রথম দিকে স্বামীর গৃহে বসবাস করতে চান। কারণ এখানে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি রয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। প্রায়ই নিজের পরিচিত স্থান থেকে সরে আসতে হয়। পরিচিত স্থান ছেড়ে আসার যাতনা কখনো কখনো তীব্র হতে পারে। রোগশোক আস্তে আস্তে কাবু করে ফেলে। আবেগময় আচরণের পরিবর্তন শুরু হয়। অল্পেই চিৎকার, বকাবকি, হইচই, অভিশাপ, নালিশ করেন। নিজেকে সংসারের অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি মনে করেন। সংসারের বোঝা মনে করতে থাকেন। মৃত্যুচিন্তা আসে। কীভাবে কখন মৃত্যু হতে পারে তা নিয়ে ভাবেন। নিজেকে নিয়ে অনেক সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সমাজের অনেকেই বিশ্বাস করেন, যৌবনে একজন মানুষ যত সুন্দর গুণাবলি অর্জন করুক না কেন বৃদ্ধকালে কলহপ্রিয়, নীচুমনা, সন্দেহপ্রবণ, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিতে পরিণত হন।

ছেলেবেলায় গ্রামে মা-চাচিদের মুখে শুনতাম, 'চাল নষ্ট মুড়ি, পাড়া নষ্ট বুড়ি'। অর্থাৎ যারা বুড়ি তাদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। বুড়ি শাশুড়ির ভূমিকায় থাকে। সদ্য ক্ষমতা হারানোর যাতনা তাকে আচরণে আক্রমণাত্মক করে তোলে। ক্ষমতার পালাবদল, শারীরিক পরিবর্তন, মানসিক যাতনা সব কিছু মিলিয়ে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এ অবস্থায় ছেলেমেয়েরাই বিধবা নারীর আশ্রয় হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েরা বার্ধক্যের এ সংকট সম্পর্কে সচেতন না হলে মাকে বুঝতে পারবে না। বৃদ্ধ বয়সের হতাশা, অসন্তোষ, ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দেয় জীবন ব্যর্থ। মায়ের এ সংকটকালে সন্তানের উপস্থিতি, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, কর্তব্য পালন খুবই জরুরি।

আমাদের দেশের ১ কোটি প্রবাসী শ্রমিক এবং শহরে চাকরি-ব্যবসায় নিয়োজিত অধিকাংশের মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। তারা মাকে প্রত্যক্ষভাবে সেবাযত্ন করতে পারেন না। মায়ের বার্ধক্য স্বস্তিময়, শান্তিপূর্ণ, কর্মক্ষম রাখতে সন্তানসন্ততি, নিকটাত্মীয়ের সঠিক ভূমিকা পালন জরুরি। নারীর বার্ধক্য শান্তিপূর্ণ, আনন্দদায়ক না হলে জন্মদান হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যেতে পারে বলে আমার ধারণা। মাকে ভালোবাসি মানে মাকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করি, যাতে তিনি স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারেন। মাকে সহযোগিতা করি মানে মাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম ছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম আনন্দের সঙ্গে করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারায় সহায়তা। মাকে খুব মনে পড়ে মানে মার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা। যিনি বৃদ্ধা হবেন তাকেও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে হবে, যাতে করে নিজের সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন হয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম উপভোগ করতে পারেন।

সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন মেলা, বিয়ে, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা দরকার, যাতে করে বিভিন্ন বয়সী লোকের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ রাখা সহজ হয়। বর্তমান কর্মকাণ্ড উপভোগ করার মতো মানসিক ক্ষমতা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বৃদ্ধ নারী অলস, কল্পনার জগতে বসবাস করেন, সব সময় সমালোচনামুখর, প্রতিনিয়ত স্মৃতিচারণ করেন তারা তুলনামূলক বেশি কষ্ট পান। বৃদ্ধ বয়সে সুখী হওয়ার জন্য স্বীকৃতি, কৃতিত্ব, স্নেহ-ভালোবাসা অবশ্যই প্রয়োজন। যুব বয়সে যারা এসব অর্জন করেছেন, তারা সহজেই বৃদ্ধ বয়সে তা অর্জন করতে পারেন।

মাকে তার পছন্দের জায়গায় বসবাস করতে সহায়তা করুন। তার ওষুধপথ্য, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বিনোদনের প্রতি সজাগ থাকুন। এসব না করলে আইনের চোখে আপনি একজন অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে একদিন মায়ের সঙ্গে কিছু সময় গল্প করে কাটান। যারা দূরে থাকেন, তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মায়ের সঙ্গে দেখা করুন। মায়ের হাতখানি ধরে পাশে বসুন। তাকে বলুন, 'মা আমি তোমায় ভালোবাসি। এ সুন্দর পৃথিবী তুমি আমাকে দেখালে। আমার জন্য জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছ।'

প্রবীণের দাম্পত্য সংকট

দাম্পত্য সংকট কবে থেকে শুরু হয়েছে তা হয়ত অনুমান করে বলা যাবে কিন্তু কবে শেষ হবে সেটা বলা সম্ভব নয়। দাম্পত্য সংকট একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই সংকট দেখে অনুমান করে কথা বলা মোটেও সংগত হবে না। দাম্পত্য শুরু হয় পরস্পর বিপরীত চিন্তা-চেতনা রুচি-সংস্কৃতিসম্পন্ন দুজন মানুষকে কেন্দ্র করে। দাম্পত্য শুরু করার আগে দুজনের জানাশোনা, প্রেম-ভালোবাসার মানে হলো একে অপরকে জানাবোঝা। ভবিষ্যতে এই মানুষটির সাথে বিছানা, টয়লেট, সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, বডি লোশান ভাগাভাগি করা যাবে কি না তার পূর্ব প্রস্তুতি। শপিং করার মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায় বৌয়ের জন্য কতখানি খরচ করার মন আছে। রেস্টুরেন্টে খাবার, বেড়াতে যাবার মধ্য দিয়ে সঙ্গী আঁচ করতে পারে ভবিষ্যতে কতটা দিলদরিয়া হবে। এসব মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনুত্তীর্ণরা নিচু স্বরে বিরহের গান শুনে অথবা কবিতা লিখতে বসে।

দাম্পত্য জীবন শুরু আগে দু'পক্ষই জেতার জন্য চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে। নিজে জিতে যাচ্ছে মনে হলে বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যিনি ঠকে গেছেন মনে করেন তিনি সময়ে অসময়ে রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন।

দাম্পত্য জীবনে মানুষ পেতে চায় নিরাপত্তা, বিশ্বস্ত সঙ্গী, সন্তান, যৌনসঙ্গ। সমাজ গড়ে উঠেছে পুরুষের নেতৃত্বে ফলে সহায় সম্পদের অধিকাংশই পুরুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দিন দিন নারীরা এগিয়ে আসছে। পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীরা সমানতালে চলছে। একদা দাম্পত্যে পুরুষের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। এখন নারীর সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত কিনা এই বিতর্ক চলছে।

সমাজের পরিবর্তন বোঝার জন্য এটা একটা টুলস হতে পারে। সমাজ বিকাশের একটা সময়ে দাম্পত্য জীবনে নারী সন্তান লালনপালন, রান্নাবান্না, গৃহস্থালি কাজ, হাঁস-মুরগি পালন, ফসল উৎপাদন, কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। এখন নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা, কলকারখানা, বিচার, বাণিজ্য, চিকিৎসা, প্রশাসন, পুলিশসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নারীর আর্থিক সামর্থ্য অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে এখন বেশি।

প্রবীণের দাম্পত্য জীবনে পাঁচটা সংকট আমরা সাধারণত দেখতে পাই; যথা মন, শরীর, পরিবার, পরকীয়া, পরিবেশ।

দাম্পত্য জীবনে মন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন থেকে কেউ কাউকে পছন্দ না করলে, ভালো না বাসলে তার সাথে দাম্পত্যযাপন কঠিন হয়ে পড়ে। মনে তিক্ততা বাড়লে ঝগড়াঝাটি থামতে চায় না। আচরণগত ত্রুটি, বিরক্ত করা, গালি দেওয়া, খোঁটা দেওয়া, সন্দেহের তালিকায় রাখা, বিশ্বাস না করার মধ্য দিয়ে মন বিষিয়ে ওঠে।

দাম্পত্য জীবনে শরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরীর সুস্থ না থাকলে মন খারাপ হয়ে যায়। শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে সুষম খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়াম জরুরি। সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং নিয়মিত ওষুধ সেবন শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত যৌন সম্পর্ক

স্থাপনে শরীর-মন ভালো থাকে। যে কোনো ধরনের যৌন বিকৃতি সংকট বাড়িয়ে তোলে। দাম্পত্য জীবনে কোনো একজন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবাযত্ন, চিকিৎসায় বিরক্তি চলে আসে বা আসতে পারে।

পরিবারের সদস্যদের আচার আচরণ, স্বার্থপরতা, হীনম্মন্যতা, প্রতারণা, অকৃতজ্ঞতা দাম্পত্য জীবনে নানারকম সংকট তৈরি করে। সমস্যা সরাসরি স্বামী-স্ত্রীর না হলেও দুজনেই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে যান।

পরকীয়া মানে নিজের স্বামী-স্ত্রীর বাইরে অন্য কোনো নরনারীর সাথে শারীরিক বা মানসিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। এতে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন। অনেক সময় এসব অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার সত্যতা পাওয়া গেলে সারাজীবন ধরে এর জের টানতে টানতে জীবন কাহিল হয়ে যায়।

একজন মানুষের বিশের অধিক চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে। সঙ্গীর কাছ থেকে বড়জোর চার পাঁচটা চাহিদা পূরণ হওয়া সম্ভব। বাকি চাহিদা যৌথ জীবন, আড্ডা বা অন্য কোনো উপায়ে মেটানোর চেষ্টা করতে হয়। কারো গান শুনতে, গান গাইতে, ছবি আঁকতে, বেড়াতে, বই পড়তে, সিনেমা-নাটক দেখতে, আড্ডা দিতে, গল্প করতে ভালো লাগে। আবার কেউ মাছ ধরতে, বড়শি বাইতে, ঘুড়ি উড়াতে, সাইকেল চালাতে, ফুটবল খেলতে, তাস-দাবা খেলতে পছন্দ করতে পারেন। অন্যজন এসব বিষয়ে অনাগ্রহী হতে পারেন।

কোনো একজন মানুষের বিশেষ কোনো গুণ অন্য কাউকে আকৃষ্ট করতে পারে। এমনকি সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হতে পারে। কোনো কোনো সময় সেটা সীমা লঙ্ঘন করতে পারে। আমাদের সমাজে নর-নারীর সম্পর্ককে সহজ-স্বাভাবিকভাবে দেখার মনোভাব তৈরি হয় নি। নর-নারীর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত শারীরিক স্তরে নিয়ে যায় এই বিশ্বাসই প্রধান। সম্পর্ক মানেই শারীরিক এমন চিন্তাভাবনা মানব মর্যাদা বিরুদ্ধ।

দাম্পত্য জীবনে পরিবেশ বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ মানে পছন্দমতো থাকার জায়গা। বাসা খোলামেলা, আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে, বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রতিবেশীরা ভালো, পরিবারের সদস্যরা আন্তরিক হওয়া মানে ভালো পরিবেশ। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল, ঝগড়াঝাটি, মাইকের আওয়াজ, গণ্ডগোল, মারপিট, চাঁদাবাজি, রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, জলাবদ্ধতায় কোনো একজন বসবাস করতে না চাইলে অন্যজন এতে সমর্থন না করলে সংকট বাড়ে।

প্রবীণ বয়সে অনেকেরই দাম্পত্য থাকে না, থাকে দায়বদ্ধতা। সেই দায়বদ্ধতাকে গভীর প্রেম বলে চালিয়ে দেওয়া আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। দাম্পত্য মানে শারীরিক ও মানসিক সম্পর্ক। এই দুটির একটি অনুপস্থিত থাকলে দাম্পত্য থাকে না। উপায়হীন প্রবীণ নর-নারীর একত্রে একঘরে বসবাস করাকে মহিমান্বিত করে কেউ কেউ আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন।

একসাথে বসবাস করলে একজন আরেকজনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ জন্মায়, সেটাকে অনেকে দাম্পত্য বলে ভুল করে।

প্রবীণদের দাম্পত্য সংকট শুরু হলে দেখা যায়, আলাদা বিছানা, আলাদা ঘর, আলাদা বাড়িতে বসবাস। কথা বন্ধ থাকে বছরের পর বছর। কখনো একে অপরকে শারীরিকভাবে আঘাত করে। অন্য কোথাও চলে যায়। নারীরা মেয়ের বাড়ি বেশি সময় ধরে থাকে কিংবা বিদেশে বেবি সিটিং করতে চলে যায়।

দাম্পত্য সংকট কাটাতে চাইলে সম্পর্কের যত্ন নিতে হবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। প্রবীণ বয়সে এসব করা কঠিন।

একাকী প্রবীণ জীবন এবং বিয়ে বিতর্ক

একাকী প্রবীণ জীবন বলতে আমরা বুঝি যারা স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন ছাড়া জীবনযাপন করেন। এরকম পরিস্থিতি নানা কারণে মানুষের জীবনে আসতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই যৌবনে উপনীত হয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার শুরু করে। একসময় সংসারে অনেক লোক বসবাস করে, যেমন মা-বাবা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে। ভাইবোন বড় হয়ে নিজেরা নতুন সংসার করে। মা-বাবা মারা যান। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যায়। তারা লেখাপড়া শেষ করে কাজেকর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। একসময় তারাও নতুন সংসার তৈরি করে। একপর্যায়ে সংসারে শুধু প্রবীণ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকে না। প্রকৃতিগত এবং বয়সের কারণে প্রবীণ পুরুষ আগে মৃত্যুবরণ করেন। প্রবীণ নারী অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘজীবী হন। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ অব্যাহত রাখছে। সবাই স্বাধীনভাবে নিজের জীবন চালাতে চায়। এ চাওয়াটুকু খুবই স্বাভাবিক। এ স্বাধীনতা একটা সময় বিচ্ছিন্ন বন্ধুহীন, স্বজনহীন করে দেয়। সমাজটা একটা সময়ে গড়ে উঠেছিল পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে টিকে থাকবে– এ দার্শনিক ভিত্তি থেকে।

এই সেদিনও সংসারে তিনিই কর্তা ছিলেন, যিনি সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন। একে অপরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেন। ভাইবোনকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে অনেক মেধাবী সন্তান নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভাবেন নি। কৃষি, ব্যবসা, ছোট চাকরি ইত্যাদি করে সংসার টেনে নিয়েছেন। এমন মানুষও আমি দেখেছি, যিনি পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে বিয়ে করেন নি। সমাজের এ চেহারাটা পালটে গেছে। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষ বিদেশে কাজ করতে গেছেন। প্রায় ৬০ লাখ গার্মেন্ট শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছেন। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী কাজের সন্ধানে শহরের দিকে ছুটে আসছেন। গ্রামে কর্মক্ষম যুবকের সংখ্যা কমে গেছে। গ্রামে আয় কমে গেছে, একই সঙ্গে ব্যয় বেড়ে গেছে। শুধু কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে কর্মক্ষম মানুষ গ্রামে থাকতে চায় না। কৃষিজমির মালিকানা না থাকা, উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়া, কৃষিশ্রমিকের অভাব, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় এ খাতে মানুষের

অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে। ফলে বাড়ছে স্থানান্তর। স্থানান্তর বেড়ে যাওয়ায় নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী নানা ধরনের সংকটে পড়ছে। এ নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী হলো শিশু এবং প্রবীণ। প্রবীণদের মধ্যে একাকী প্রবীণরা সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছেন। তাদের একাকিত্ব ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামির মতো। ফাঁসির আসামি যেমন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে, তেমনি একাকী প্রবীণও মৃত্যুর জন্য বেঁচে থাকেন। ফাঁসির আসামির স্বজনরা যেমন তাকে দেখতে আসে, একাকী প্রবীণকেও মাঝে মধ্যে কেউ কেউ দেখতে আসে। গ্রামে একাকী প্রবীণের সংখ্যা অনেক কম। একাকী প্রবীণরা অসহায়ভাবে গ্রামে বেঁচে আছেন। তারা খাবার, আবাসন, কাপড়, চিকিৎসার দারুণ সংকটে পড়ে দিশেহারা। প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের করুণা ও দয়ায় কিংবা ভিক্ষে করে জীবনযাপন করছেন। মারা গেলে চাঁদা তুলে কিংবা সামর্থ্যবানদের আর্থিক সহায়তায় তাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রায় গ্রামেই এখন দুই-একটা বাড়ি আছে, যেখানে মালিকরা থাকেন না। বাড়ি কেয়ারটেকার দেখে অথবা তালা মারা থাকে। বছরে দুই-একবার মালিকপক্ষ বাড়িতে আসেন দুই-চারদিন থেকে আবার চলে যান। গ্রামের নেতৃস্থানীয়রা সামান্য উদ্যোগ নিলে এসব বাড়িতে একাকী প্রবীণরা দলবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। একাকী প্রবীণরা এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা পাবেন। স্থানীয় দরদি মানুষের আর্থিক সহায়তায় একাকী প্রবীণের কষ্ট কমবে। একাকী প্রবীণরা একত্রে থাকলে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবেন।

একাকী প্রবীণরা বিয়ে করতে চাইলে সমাজের বিবেকবান মানুষের উচিত হবে সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। সমাজ-পরিপার্শ্ব সহযোগিতা করলে একাকী প্রবীণ পুরুষ একাকী প্রবীণ নারীকে বিয়ে করে পরস্পরের একাকিত্ব ঘোচাতে পারেন।

ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে একাকী প্রবীণদের বেশি দেখা যায়। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বেশি থাকায় এখানে একাকী প্রবীণদের সমস্যা নগণ্য। দরিদ্র প্রবীণরা একসময় আয়রোজগার করতে পারেন না, নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। দরিদ্র প্রবীণের সন্তানরাও নিঃস্ব। তাদের পক্ষে প্রবীণ মা-বাবার সেবাযত্ন করা অসম্ভব। শহরের দরিদ্র প্রবীণরা দ্রুত একাকী প্রবীণ জীবনে প্রবেশ করেন। বস্তি, স্টেশন, টার্মিনাল, ঘাট, ফুটপাত, পার্ক, বহুতল ভবনের আশপাশে একাকী প্রবীণরা রাতযাপন করেন। শহরে একাকী প্রবীণরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। একসঙ্গে ভিক্ষে করেন, একসঙ্গে রাতযাপন করেন। অসুখ-বিসুখে একে অপরকে দেখাশোনা করেন।

একাকী এক প্রবীণ পুরুষকে একাকী প্রবীণ অন্ধ নারী বিয়ে করে ফুটপাতে সংসার করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি আমি। প্রবীণ পুরুষ আমাকে জানিয়েছেন, অন্ধ প্রবীণ নারী দুইদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কাবু হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। এখন তারা বিয়ে করেছেন। একসঙ্গে ভিক্ষে করেন। হোটেলে খান ফুটপাতে ঘুমান।

প্রবীণ নারীকে তিনবেলা ওষুধ খাইয়ে দেন। ফুটপাতে থাকা কমবয়সী ভিক্ষুকরা তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। তিনি এসবে কান দেন না। তিনি মনে করেন. তিনি মহৎ কাজ করেছেন।

দরিদ্র প্রবীণরা অনেক সময় সাহস করে বিয়ে করে ফেলেন। তারা সমাজের মানুষের কথাকে তেমন একটা পাত্তা দেন না। আবার নিম্নবিত্ত একাকী প্রবীণরা নিজেরা বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকেন। সারাদিন ছোটখাটো কাজকর্ম কিংবা ভিক্ষে করে রাতে সবাই একত্রিত হন। একে অপরের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি করে নেন। একাকী প্রবীণদের জন্য শহরে রাতযাপনের ব্যবস্থা করলে তারা স্বস্তিতে রাতে ঘুমাতে পারবেন। অসহায় একাকী প্রবীণরা শহরে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রবীণরা একাকী প্রবীণদের নানাভাবে নাজেহাল করে থাকেন। একাকী প্রবীণদের টাকা-পয়সা প্রায়ই চুরি হয়ে যায়। ভিক্ষে করে যে কটি টাকা রোজগার করেন তা হাতছাড়া হলে মনে দারুণ কষ্ট পান। একাকী প্রবীণরা শারীরিক অক্ষমতার কারণে নানা ধরনের দুর্ভোগে পড়েন। যিনি চোখে দেখেন না আবার কানেও শোনেন না তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। একাকী প্রবীণরা একাধিক রোগে ভুগতে থাকেন।

গ্রামের চেয়ে শহরে একাকী প্রবীণের সমস্যা বাড়ছে। শহরের ধনী একাকী প্রবীণের জীবন বড়ই বেদনাদায়ক। আমি একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে চিনি, যাকে বাংলাদেশে অনেকেই চেনেন। তার একমাত্র মেয়ে মারা গেছেন। প্রায় বছরখানেক পর স্ত্রী মারা গেছেন। তার বয়স বর্তমানে ৭৮ বছর। একই বাড়িতে তার ৯৩ বছর বয়স্ক শাশুড়িও থাকেন। কাজের লোক আর শাশুড়ি এই ভদ্রলোকের দেখাশুনা করেন। ঢাকা শহরের ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা, বারিধারার মতো অভিজাত এলাকায় একাকী প্রবীণদের অবস্থান বেশি। তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকেন অথবা শহরের অন্য কোথাও আলাদা বাড়িতে থাকেন।

ধানমণ্ডিতে আমি একজন একাকী প্রবীণ নারীকে চিনি, যিনি একসময় আমার সহকর্মী ছিলেন। লেকের পাড়ে এক বিঘা জমির ওপর আড়াইতলা বাড়ি। ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকে। স্বামী বছরতিনেক আগে মারা গেছেন। পুরো বাড়ি খালি। বাড়িতে দারোয়ান, কাজের লোক আর পাঁচটা দেশি কুকুরের বসবাস। সকালে ধানমণ্ডি লেকে হাঁটতে গেলে মাঝে মধ্যে দেখা পাই। তার সেই হাসি হাসি মুখখানি আমাকে প্রীত করে। আমি বুঝতে পারি তিনি কতটা অসহায়। আমার সবচেয়ে কাছের একজন মানুষ, তিনি পেশায় আইনজীবী। সকালে তার সঙ্গে আমি নিয়মিত ধানমণ্ডি লেকে হাঁটতে যাই। একসঙ্গে ফিরে আসি। তিনি দাবি করেন, তিনি ভালো আছেন। আমি তার নিঃসঙ্গতা এবং একাকিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। তার বয়স বাড়তে থাকলে নির্ভরতাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে।

বার্ধক্য আমাদের উন্নয়নের ফসল। এই ফসল আমাদের ভোগ করতে হবে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। অচিরেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হব। তখন পাল্লা দিয়ে গড় আয়ুও বেড়ে যাবে। উন্নত আয়ের দেশ হলে তখন গড় আয়ু ১০০ বছরের কাছে চলে আসবে।

গ্রামে একসময় প্রবীণ ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলে ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন উদ্যোগী হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। যুক্তি দেখানো হতো, সেবাযত্ন, সংসার দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক লাগবে। প্রবীণ নারীর স্বামী মারা গেলে তাকে পুনর্বিবাহ করার জন্য কাউকে উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হলে প্রবীণ নারী ও পুরুষের নিঃসঙ্গতা যেমন কাটবে, তেমনি ব্যয়সাশ্রয়ী জীবনযাপন সম্ভব হবে। খাবার টেবিলে নানারকম খাবার সঠিক পুষ্টি জোগাতে সহায়তা করবে। একাকী প্রবীণরা পুষ্টিহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আমাদের সমাজ ভীষণভাবে একাকী প্রবীণদের বিয়ে করার বিপক্ষে। আমরা প্রবীণদের মা-বাবা হিসেবে দেখতে চাই। তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করুক, এটা আমরা চাই না। প্রবীণের যৌনজীবনকে আমরা গুরুত্ব দিতে চাই না, বরং অবহেলা করি। একাকী প্রবীণ সঙ্গী পেলে বা বিয়ে করলে বেশি ভালো থাকবেন। সমাজের কথা, নিজেদের মানসম্মানের কথা ভেবে প্রবীণকে সঙ্গিহীন রাখা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। একাকী প্রবীণ সঙ্গী পেলে নতুন উদ্যমে ঘরসংসারে মন দেবেন। রোগ-শোক মোকাবিলা করার সাহস পাবেন। একে অপরের জন্য অনেক বেশি আন্তরিক হবেন।

নির্ভরশীল একাকী প্রবীণকে স্থানীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদি সেবাদানের কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একাকী প্রবীণ নারী ও পুরুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক। একাকী প্রবীণের বিয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা গভীর নীরবতা রয়েছে। সব পক্ষ নানা অজুহাতে মুখ বন্ধ করে আছে। সুষ্ঠু-স্বাভাবিক জীবনের জন্য একাকী প্রবীণের সঙ্গী এখন সময়ের দাবি।

বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গতা এক দুঃসহ যন্ত্রণা

নিঃসঙ্গতা সব সময়ই কষ্টের, কারণ মানুষ একা থাকতে পারে না। মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেছিল এক হয়ে। শিকারের প্রয়োজনে ও পরে কৃষিনির্ভর জীবন মানুষকে দলবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে। সমাজ পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে উন্নততর জীবনের প্রত্যাশায়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জিত সম্পদ জমা হয়েছে ব্যক্তির হাতে। ব্যক্তি হয়ে উঠেছে প্রভু। অশুভ প্রতিযোগিতায় মেতেছে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিতে।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির উন্নতিতে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গেছে অনেক। মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সম্পদ অর্জনে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে, নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ নিতে। ফলে তৈরি হচ্ছে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অশান্ত পরিবেশ। এতে কষ্টে পড়ে শিশু, নারী, বৃদ্ধ। জীবিকার জন্য মানুষ সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। কাঁটাতার, গুলি উপেক্ষা করে সীমান্ত অতিক্রম করছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কাছে বলি হচ্ছে মানবতা। উপেক্ষা করছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। ফলে হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তার হাতে মানুষ আজ বন্দি।

ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠনের নাম পরিবার। পরিবারে আমরা জন্মলাভ করি। পরিবারে বড় হয়ে উঠি। যৌবনে নিজেরা পরিবার গড়ি। বার্ধক্যে পরনির্ভরশীল হয়ে অন্য কোনো পরিবারে নতুবা ‘শূন্য বাসায়’ বসবাসে বাধ্য হই। প্রবীণ বয়সে নিঃসঙ্গতা দু’ধরনের। একটি হলো স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের অভাব। অপরটি হলো সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। সাধারণত পুরুষের তুলনায় নারীদেরই অধিক হারে বৈধব্যবরণ করতে হয়। কারণ বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের বয়স বেশি থাকে। আবার নারীর গড় আয়ু বেশি অর্থাৎ নারী বেশিদিন বাঁচে।

কে বেশি নিঃসঙ্গতায় ভোগে বিপত্নীক নাকি বিধবা? একদল সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, বৈধব্যে একজন প্রবীণ নারী সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে। সমাজ প্রবীণ বিধবার পুনঃবিবাহকে সমর্থন করে না। একজন বৃদ্ধা তার চেয়ে কমবয়সী কাউকে বিয়ে করার সুযোগ পায় না বললেই চলে। অন্যদিকে বিপত্নীক বৃদ্ধ সহজেই তার চেয়ে কমবয়সী কোনো বিধবাকে বিয়ে করার সুযোগ পান। কখনো আবার তারা কমবয়সী অবিবাহিত নারীকেও বিয়ে করেন। বিপত্নীক প্রবীণ পুনঃবিবাহের মাধ্যমে নিঃসঙ্গতাকে মোকাবিলার চেষ্টা করেন। নতুন স্ত্রীর সঙ্গে বেশিরভাগ সময় সখ্যতা, ঘনিষ্ঠতা, নির্ভরশীলতা, আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। অনেক সময় সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজনের অসহযোগিতায় দাম্পত্য জীবন গভীর সংকটের মুখে পড়ে। ফলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দিন দিন বাড়তে থাকে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের জীবন-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা কর্মস্থলে দূরে থাকায় মা-বাবাকে তেমন একটা সময় দিতে পারে না।

বৈধব্য বিপত্নীক বিধবা দুইজনের জন্যই বিরাট একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা। শূন্য বাসায় বন্দি জীবন কাটানো সত্যিই দুঃসহ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বিপত্নীক প্রবীণ অন্য বিধবা প্রবীণকে সমব্যথী হিসেবে গ্রহণ করে কিছুটা স্বস্তি পায়। বিবাহবিচ্ছেদ হলে নারী-পুরুষ উভয়েই ভয়ানক সংকটে পড়ে। সামাজিক-পারিবারিক সংকট প্রবীণদের নাজেহাল করে তোলে। বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কে দায়ী এর চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়। বিপর্যয় ঘটে বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কেও। প্রবীণ বয়সে বৈবাহিকসূত্রে প্রাপ্ত আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ে।

বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। ছেলেমেয়ে না থাকলে প্রবীণদের সংকট আরো বেশি। আর্থিক সহযোগিতা, ভরণপোষণ, চিকিৎসা, সেবাযত্ন পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। তালাকপ্রাপ্ত প্রবীণরা জীবনের শেষ দিনগুলোতে চরম নিঃসঙ্গতায় ভোগেন।

চিরকুমার-চিরকুমারী জীবনের ওপর গবেষণা হয়েছে। তারা বিবাহিত নারী-পুরুষের চেয়ে বেশি অসুখী হয়ে থাকেন। তারা চাকরি থেকে অবসর নিলে মনোবল হারিয়ে ফেলেন। কোথায় কার সঙ্গে থাকবেন এ হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ বয়সে সঠিক পরিচর্যা, সেবাযত্নের অভাবে শরীর ভেঙে পড়ে। নিকটতমদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কমতে থাকে। ফলে নিষ্ঠুর একাকিত্ব তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় চিরকুমার বা

চিরকুমারী অথবা বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্তরা পরিবার-পরিজন আত্মীয়স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন।

আবার শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণদের জীবন ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা-একাকিত্ব গ্রাস করে রেখেছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রবীণ ঘর থেকে কারও সাহায্য ছাড়া বাইরে বেরোতে পারেন না। স্বাধীনভাবে ইচ্ছামতো কোথাও যাওয়া অসম্ভব বলে বাইরের জগৎ থেকে তারা নিজেকে ক্রমেই সরিয়ে নিয়ে আসেন বা আসতে বাধ্য হন। মনোবল আস্তে আস্তে কমে যায়। একসময় নিজেকে গুটিয়ে নেন। আর যেসব প্রবীণ বিছানায় পড়ে আছেন, তাদের একাকিত্ব অকল্পনীয়। যেসব প্রবীণ চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না তারা সামাজিক জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রবীণের সেবাযত্ন ব্যয়বহুল এবং কষ্টকর। আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রবীণ যথাযথ সেবাযত্নের অভাবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হন। সামাজিক যোগাযোগ একেবারেই কমে যায়। আত্মীয়স্বজন তাদের তেমন একটা খোঁজখবরও নেয় না।

সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ হলো মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণ। শিশুকালে, যৌবনকালে মা-বাবা, ভাইবোনরা সেবাযত্ন, খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব পালন করে। একসময় মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি প্রবীণ বয়সে উপনীত হন। তখন মা-বাবা জীবিত থাকেন না। ভাইবোন থাকলে তারাও প্রবীণ হন। আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে আত্মীয়স্বজন সেবাদানকারী নিয়োগ দেন। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানসিক প্রতিবন্ধী প্রবীণ সীমাহীন দুর্ভোগ আর নিঃসঙ্গতায় ভোগেন।

প্রবীণ জীবনের শেষের দিনগুলো অর্থাৎ ৭০ বছরের পর থেকেই অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ আসতে শুরু করে। প্রথম আসে আর্থিক চ্যালেঞ্জ, এরপরই আসে নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা থেকে প্রবীণগণ শারীরিক মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারও সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার সুযোগ নেই। তাদের সুখ-দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না। নানা অজুহাতে প্রায় সবাই এড়িয়ে যায়।

বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে প্রবীণ ব্যক্তিরা কিছুটা বেশি বলেন। এটাকে অনেকেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন না। তারা প্রবীণদের প্যাঁচাল শুনতে বিরক্তবোধ করে এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে। প্রবীণ জীবনের শেষ দিনগুলোতে আর্থিক, সামাজিক, শারীরিক, মানসিক শক্তি অনেক বেশি দুর্বল থাকে। ফলে সংসারে-সমাজে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। প্রবীণ বয়সে দুইটি বিষয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি হয়। একটি হলো স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হওয়া, আরেকটি হলো ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়া। ডিমেনশিয়া হলো স্মৃতি ক্ষয়জনিত রোগ অর্থাৎ নিকট অতীতের অনেক কিছু ভুলে যাওয়া, যেমন চেনা পথ হারিয়ে ফেলা, ছেলেমেয়েদের নাম ভুলে যাওয়া, উদ্যম হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি। তাদের সঙ্গে সঙ্গ দিতে অনেকেই আগ্রহবোধ করেন না। তারা সামাজিক এবং পরিবারিকভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য প্রবীণরা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলাধুলা, গল্প করা, সেবাযত্ন করা, অভিযোগ শোনা, দাবি-দাওয়া মেটানোর চেষ্টা করেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করেন। যাদের এ সুযোগ থাকে না তারা ধর্মীয় কাজ, সামাজিক কাজ করে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন। এখন সময় এসেছে প্রবীণ জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটাতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়ার। প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা কাটাতে ডে-কেয়ার সেন্টার, প্রবীণ ক্লাব, প্রবীণ হোটেল, বিনোদন ক্লাব তৈরি করতে হবে।

প্রবীণের কর্মদক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। তা ছাড়া, সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে প্রবীণদের সামনের কাতারে অংশ নেওয়ার সুযোগ দান; ঝগড়া-বিবাদ, সম্পদের মালিকানা বণ্টন, বৈবাহিক সংকট নিরসনে প্রবীণদের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রবীণরা যত বেশি কাজেকর্মে থাকবেন নিঃসঙ্গতা তত দূরে থাকবে। শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের উপযোগী বিনোদন অনুষ্ঠান, গান-বাজনা, ছায়াছবি তৈরি করতে হবে। এ বিশেষ প্রবীণদের সঙ্গদানে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

মধ্যবয়সী নারীর সতর্কতা

সব বয়সেই নারীর সতর্কতা জরুরি। মধ্যবয়সী নারী বলতে আমি বুঝি যাদের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রয়েছে। এই বয়সে অধিকাংশ নারী সংসার জীবনে থাকেন। তাদের ছেলেমেয়ে বড় হয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কেউ কেউ ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সামাজিক নানান ঘটনায় মধ্য বয়সী একা নারীর সংখ্যা বাড়ছে। তাদের প্রতি কুনজর দেওয়ার লোকজনও জুটে যায়।

এই বয়সে নারীর মেনোপজ হবার কারণে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হতে থাকে। মধ্যবয়সী অল্প কিছু সংখ্যক নারী চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত থাকেন। আবার কেউ কেউ স্বামীর অবর্তমানে সংসারের হাল ধরেন।

মধ্যবয়সে এসে নারী প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব মিলাতে বসেন। ফেলে আসা দিনগুলোতে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন সেসব চোখের সামনে ভাসতে থাকে। পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে কী ধরনের অসহযোগিতা পেয়েছেন সেসব কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কেউ কেউ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেন।

নারীর হাতে সঞ্চিত অর্থ স্বামী-সন্তান, ভাইবোনের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় হবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। এমনিতেই নারীর হাতে সহায় সম্বল কম থাকে, তার উপর পারিবারিক সংকট হলে তাকে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। মধ্যবয়সী নারীদের কেউ কেউ একঘেয়ে ভালোবাসাহীন দাম্পত্য জীবনে হাঁফিয়ে ওঠেন। কিন্তু সামাজিক পারিবারিক কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটাবার মতো সাহসী হতে পারেন না। ফলে বিরক্তিকর অসম্মানজনক দাম্পত্য যাপনে বাধ্য হতে হন।

নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মেটাতে কেউ কেউ পুরুষ বন্ধু বানিয়ে ফেলেন। পুরুষ বন্ধুর সামাজিক ও আইনগত স্বীকৃতি না থাকায় অনেকটা গোপনেই বন্ধুত্ব চলে। এসবকে কেন্দ্র করে হত্যা, আত্মহত্যা, পারিবারিক ভাঙন, তালাক, নির্যাতন বেড়ে যায়। পুরুষ বন্ধুদের কেউ কেউ নারীর সহায় সম্বল হাতিয়ে নিয়ে সটকে পড়েন। অতি মুনাফার লোভে গোপনে বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া নারীর সংখ্যাও কম নয়। সাম্প্রতিক কালের হায় হায় কোম্পানিতে বিনিয়োগকারীদের দিকে তাকালে এই কথার সত্যতা মিলবে।

অতএব যা করতে হবে তা হলো শরীর ও মনের যত্ন নিন, দলবেঁধে আড্ডা দিন, বেড়াতে যান, মন খুলে হাসুন, নিজ ঘরে নাচুন, গান শুনুন, পরিমিত খান, সামাজিক কাজে এগিয়ে আসুন, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলুন। বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন!

সুখের এবং অপরাধের চূড়ান্ত কোনো রূপ নেই। সুখের ধারণা একেক মানুষের কাছে একেকরকম। কোনো এলাকায় যেটা অপরাধ, সেটা অন্য এলাকায় অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ফলে এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো ঝুঁকিপূর্ণ। ঝামেলা এড়িয়ে চলুন, ঝরঝরে থাকুন!

প্রবীণের যৌন জীবন নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের সমাজ জীবনে যৌনতা নিয়ে রাখঢাক বিস্তর। এ বিষয়ে আলোচনা উঠলে উপস্থিত সকলের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়। প্রাণিজগতে মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রাণীর যৌনতা উন্মুক্ত। শিশু যখন প্রকৃতিতে খোলামেলা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দৃশ্য দেখে, তখন কৌতূহলবশত নানারকম প্রশ্ন বাবা-মায়ের কাছে করে। বেশিরভাগ সময়ই শিশু সঠিক উত্তর পায় না। পরিবারের অন্য সদস্যরা মুখ টিপে হাসে অথবা এড়িয়ে যায়।

শিশুরা যখন কিশোর-কিশোরী হয়ে ওঠে তখন শারীরিক নানা পরিবর্তন শুরু হয়। বিশেষ করে যৌনাঙ্গের পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তনের সময় কিশোর-কিশোরীদের সঠিক তথ্য পৌঁছানোর সুযোগ এখানে কম। স্কুলে পাঠ্যসূচিতে যৌনতা ও যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ক অধ্যায়ের আলোচনায় গভীরতা তেমন একটা থাকে না। ফলে কিশোর-কিশোরীর মনে উঁকি দেওয়া প্রশ্নের সুরাহা হয় না। তারা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ সমবয়সী বন্ধুবান্ধব, ইন্টারনেট কিংবা চটি বই থেকে উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। কিশোর-কিশোরীর মধ্যে যৌন তাড়না প্রবল থাকায় কখনো কখনো তারা অনুমোদনহীন যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সমাজ-ধর্ম-আইন কোনোটিই অনুমোদন করে না। বিয়ের জন্য আইনে মেয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ এবং ছেলের বয়স ২১ নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। সমাজ ঠিক করেছে ছেলে বউয়ের ভরণপোষণ দেবার সামর্থ্য অর্জন না করা পর্যন্ত বিয়ে করা ঠিক নয়। ধর্মের বিধান হলো স্ত্রীর ভরণপোষণ দেবার সামর্থ্য অর্জন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিয়ের গড় বয়স দিন দিন বাড়ছে।

দাম্পত্য জীবনের নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জ শিক্ষিত সচেতন ছেয়েমেয়েদের চিন্তিত করে তুলেছে। ফলে তারা ত্রিশে এসেও বিয়ে করতে চাচ্ছে না। বরং পরিবারের কাছে আরো কিছু দিন সময় চেয়ে বাবা-মার কপালের বলিরেখা দীর্ঘ করে দিচ্ছে।

বিবাহিত নর-নারীর বড় একটা অংশ বিয়ের দুই বছরের মধ্যেই সঙ্গীর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা তাদের খানিকটা আচ্ছন্ন করে রাখে। সন্তান-সন্ততি হবার পর কারো কারো শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব বেড়ে যায় এবং ক্রমেই যৌনকর্মে আগ্রহ কমে যায়। চল্লিশ পার হওয়া নারী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক কয়েকটি রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

"যৌনকর্মে আনন্দ পাই অথবা আমি সেক্স এনজয় করি"– এমন কথা আমাদের নারীরা কালেভদ্রে হয়ত বলেন। নারীর যৌনসুখ নিয়ে পুরুষের তেমন কোনো ভাবনা নেই। যৌনতার সুখ পুরুষের একচ্ছত্র দখলে। ফলে পুরুষ নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধের নামে নারীর যৌনসুখকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যৌন সম্পর্ক স্থাপনে পুরুষকে মূল ভূমিকা পালন করতে হয়। শারীরিক ও মানসিক কারণে এই ভূমিকা পালনে অক্ষমতা প্রকাশ দাম্পত্য জীবনে নানা ধরনের সংকট তৈরি করে। সুস্থ স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক দাম্পত্য জীবনের অনেক কঠিন পরিস্থিতিকে সহজ করে তোলে। সক্রিয় যৌন জীবন নারী-পুরুষ উভয়কেই হাসিখুশি, সন্তুষ্ট ও বার্ধক্যের প্রভাব মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। যৌন জীবনে পুরুষ প্রধানত তিনটি সমস্যায় পড়েন :

প্রথমত, লিঙ্গ উত্থিত না হওয়া বা ইরেক্টাইল ডিসফাংশন; দ্বিতীয়ত, দ্রুত বীর্যপাত হওয়া এবং তৃতীয়ত, যৌনকর্মের প্রতি অনীহা। যৌন অক্ষমতা বলতে বোঝায় সঙ্গীকে পরিপূর্ণ যৌন তৃপ্তি দিতে না পারা বা বঞ্চিত করা। পুরুষ শারীরিক ও মানসিক কারণে যৌন অক্ষমতায় ভোগে।

শারীরিক কারণগুলোর মধ্যে আছে– ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, দুরারোগ্য ব্যাধি, অতিরিক্ত মদ্যপান, ধূমপান, মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবন, এন্টি ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ সেবন ইত্যাদি। আর মানসিক কারণগুলো হলো– কর্মস্থলে চাপ, অস্থিরতা, পারিবারিক সংকট, সম্পর্কের জটিলতা, যৌন সক্ষমতা নিয়ে দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশান, অপরাধ বোধ, সেক্সুয়াল ট্রমা ইত্যাদি।

যৌন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা না থাকায় হারবাল কোম্পানিগুলো প্রতারণার সুযোগ বেশি পায়। বাজারের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে কোনো ওষুধ সেবন কিংবা ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। যৌন অক্ষমতা তৈরি হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ১৮/২০ বছরের যুবকের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লিঙ্গ উত্থিত হতে পারে। ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে কয়েক মিনিট লাগতে পারে। ষাটোর্ধ্ব প্রবীণের লিঙ্গ উত্থিত না হওয়ার মানে এই নয় যে তিনি যৌনকর্মে অক্ষম। প্রকৃতিগত কারণে

প্রবীণদের লিঙ্গ উত্থিত হতে খানিকটা বেশি সময় নিতে পারে। একবার বীর্যপাত হলে একজন প্রবীণ পুরুষের একদিন বা তারো বেশি সময় লাগে পুনরায় উত্থিত হতে। লিঙ্গ উত্থিত না হওয়া বয়স্ক পুরুষের রোগ নয়, এটা যে কোনো বয়সী পুরুষের হতে পারে। একজন বয়স্ক পুরুষ যত বেশি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন, তিনি তত বেশি যৌনকর্মে পটু হবেন। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রবীণ হবার আগেই নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

৩৮ বছর পার হলে পুরুষের পেনিসের দিকে রক্ত সরবরাহকারী ধমনী কিছুটা সংকুচিত হতে থাকে। উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল ইরেকটাইল ডিসফাংশন হবার অন্যতম কারণ। চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যালকোহল সীমিত আকারে গ্রহণ করা যায়। অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল সেবন করলে যকৃত ও স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। ধূমপানের নিকোটিন রক্তনালি সংকুচিত করে দিতে পারে।

নিজের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে। নিজের ওজন যদি আদর্শ ওজনের চাইতে ২০ শতাংশ বেশি হয়, তবে অবশ্যই দ্রুত ওজন কমিয়ে আনতে হবে। শরীর চাঙ্গাকারী খাবার এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে ক্যাফেইন সমৃদ্ধ খাবার। শরীর দারুন ফিট হওয়া ইরেক্টাইল ডিসফাংশনের সম্ভাবনা কমায় না, শুধু নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। পেনিস উত্থিত হচ্ছে কিনা এই পরীক্ষা বারবার করা কিংবা পেনিস উত্থিত করার জন্য আর কী কী উদ্যোগ নেওয়া যায় ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। যৌনাবেগ তৈরি করতে শরীরের বাইরের অংশ অর্থাৎ ত্বকের উপরিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমাদের অধিকাংশ মানুষের মাথায় পেনিস আর ভ্যাজাইনা ছাড়া আর কোনো কিছু কাজ করে না।

বিধবা, ডিভোর্সি, অবিবাহিতা নারীর যৌন চাহিদা পূরণে বিয়ে একমাত্র বৈধ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। তাদের অন্য কোনো উপায়ে বা মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণে সমাজ পরিবার রাষ্ট্র কোনো স্বীকৃতি দেয় নি। যৌনকর্মে অক্ষম পুরুষের স্ত্রীর মানসিক কষ্ট লাঘবে সঙ্গীর ভূমিকা গৌণ। এই নারীরা নিন্দা এবং পাপের ভয়ে দিনের পর দিন যৌন মিলনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদের অনেকেই বাইরে হাত বাড়ানোর ঝুঁকি নিতে রাজি হন না। বিশেষ করে যৌনরোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা, গোপন সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যাবার ভয়, পরিবারের সদস্যদের মান সম্মান, নিরাপদ স্থানের অভাব, সঙ্গীর বিশ্বস্ততা, ইত্যাদি বিবেচনায় যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন না। বিশেষ করে মধ্যবয়সী ও প্রবীণ নারীরা দিন দিন যৌন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তারা নতুন করে কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন না। অজ্ঞতা, ভুল ধারণা, কথিত সামাজিক মূল্যবোধ যৌন জীবনকে অসুখী করতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। ক্লান্তি, অবসাদগ্রস্ততা, শোক, বয়স্ক নারীকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অনাগ্রহী করে তোলে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা সবচেয়ে কম। কর্মক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক নারী এগিয়ে আসায় চিন্তা-চেতনা, রুচি-সংস্কৃতি,

দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু পরিবর্তন চলে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মরত ও উচ্চশিক্ষিত নারীদের একটি অংশের যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ বেড়েছে।

সাংসারিক চাপ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে যৌন চাহিদার কথা অনেকেরই মাথায় আসে না। অধিকাংশ নারী বয়স হয়ে গেছে বিবেচনায় গোটা বিষয়টি এড়িয়ে যান। প্রায় পঁচিশ শতাংশ বয়স্ক নারী মনে করেন বয়স বাড়লেও যৌনতা জরুরি।

পুরুষ স্বাবলম্বী হবার কারণে তার মধ্যে বহুগামী হবার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। সমাজ, পরিবার পরিজনের চাপের মুখে অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ পথ এড়িয়ে চলেন। বর্তমানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। এতে করে ভবিষ্যতে পুরুষের উপর আর্থিক নির্ভরতা অনেকখানি কমে যাবে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমাজ জীবনে অনেক বড় বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। 'যৌনতা পুরুষের একার বিষয় নয়'– এই ধারণা জোরদার হয়ে সমাজচিত্র বদলে যেতে পারে।

নিম্নবিত্ত প্রবীণ নারীর চ্যালেঞ্জ

নিম্নবিত্ত প্রবীণ নারী বলতে বোঝায়– যারা ভাত, কাপড়, চিকিৎসা, আশ্রয়ের সংকটে আছেন। প্রবীণ নারীর জীবনে চার অধ্যায় রয়েছে। স্বামীসহ জীবন, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, অবিবাহিত জীবন।

যেসব প্রবীণ নারী স্বামীসহ বসবাস করেন, তারা শারীরিকভাবে অনেকটাই দুর্বল। যৌবনে হাড়ভাঙা খাটুনি, অপুষ্টি, অধিক সন্তান জন্মদানের কারণে অসংক্রামক কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ঠিক সময়ে ডাক্তার দেখাতে না পারার কারণে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। টাকা-পয়সার অভাবে নিয়মিত ওষুধ কিনতে পারেন না। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজে যেতে পারেন না, ফলে আয়-রোজগার কমে যায়।

প্রবীণ নারীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। যাদের কম বয়সে স্বামী মারা গেছেন, তারা অনেক কষ্ট সংগ্রাম লড়াই করে ছেলেমেয়ে লালনপালন করেছেন। সেই ছেলেমেয়ে বড় হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবীণ নারীরা সন্তানের সঙ্গে থাকেন। অল্প কিছুসংখ্যক একাকী থাকেন।

নিম্নবিত্ত প্রবীণাদের মধ্যে তালাকের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। কারো কারো একাধিক বিয়ে হয়। তালাকপ্রাপ্ত নারীর জীবন অধিক সংকটময়। ঘর সংসার ভেঙে যাওয়ার কারণে সামাজিক ও পারিবারিক লাঞ্ছনার শিকার হতে দেখা যায়। কাজকর্মে নিয়োজিত হতে না পারার কারণে আয়-রোজগার থাকে না।

অবিবাহিত প্রবীণ নারীরা কম বয়সে আয়-রোজগার করে মা-বাবা, ভাইবোনকে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ভাইবোনের ছেলেমেয়েদের দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ প্রতারকের খপ্পরে পড়ে সব কিছু হারিয়েছেন।

নিম্নবিত্ত প্রবীণ নারীর সংকট সবচেয়ে বেশি। কর্মজীবনে পিয়ন, আয়া, বুয়া, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সেবাকর্মী, ক্লিনার, কৃষিশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক বা পোশাক কারখানার কর্মী হিসেবে চাকরি করতেন। যা কিছু আয় রোজগার করেছেন, তার সবটুকু পরিবারের জন্য, ছেলেমেয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। কোনো ধরনের সঞ্চয় ছিল না। এরা চরম আর্থিক সংকট মাথায় নিয়ে জীবন বয়ে বেড়ান। অল্প সংখ্যক নারী বসবাস করার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে চলে যান। কিছুসংখ্যক নারী মানুষের দয়া-অনুগ্রহ-কৃপা গ্রহণ করে বেঁচে আছেন। কেউ কেউ ভিক্ষা করেন। এই ভিক্ষা করা টাকাও অনেককে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের দিতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় তাদের এই ভিক্ষা করা টাকা প্রতারণা করে অন্য কেউ নিয়েও যায়। বিশেষ করে যাদের কাছে টাকা জমা রাখা হয়, তারা কেউ কেউ টাকা দিতে অস্বীকার করে।

ফুটপাতে, বড় দালানের নিচে, রেল স্টেশনে, লঞ্চঘাটে, বাস স্টেশনে প্রবীণ নারীদের রাত কাটাতে দেখা যায়। কখনো কখনো সমাজসেবা বিভাগের লোকজন তাদের ধরে নিয়ে ভবঘুরে কেন্দ্রে রাখার চেষ্টা করে।

অসুস্থ প্রবীণ নারী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার জন্য আসেন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা ও হয়রানির অভিযোগ করতে দেখা যায়। রোগ নির্ণয় করার পর যে ওষুধ লাগে, তা কেনার টাকা থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি হতে পারলে অনেক সময় সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারেন। অপুষ্টিজনিত কারণে ঘন ঘন অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হন। তারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ কিংবা পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকেও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার খবর পাওয়া যায়। সহায়-সম্পদ কিছু থাকলে ছেলেমেয়েরা হাতিয়ে নিয়ে যায়।

প্রবীণ নারীকে সেবাকর্মী হিসেবে স্বামীর সার্বক্ষণিক সেবাযত্ন করতে হয়। ছেলেমেয়ে থাকলে তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করতে হয়। রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজ করতে হয়। স্কুলপড়ুয়া নাতি-নাতনিদের স্কুল থেকে বাসায় আনা-নেওয়া করতে হয়। এসব কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখেন। এটাই তাদের একমাত্র বিনোদন। লেখাপড়া না থাকায় নলেজ ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করার সুযোগ নেই। কাজ পাওয়া যায় শারীরিক পরিশ্রমের। সেটা একসময় আর সম্ভব হয় না, শরীরের শক্তি লোপ পাওয়ায়।

অনেকেই বয়স্ক ভাতা পান। সামান্য এই ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। প্রবীণ নারী সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হন। পরিবারের সদস্যরাও অভাব-অনটনের মধ্যে থাকায় তাদের পক্ষে মায়ের সেবাযত্ন যথাযথভাবে করার সুযোগ থাকে না।

আমরা ভুলে গেছি, এই প্রবীণ নারীরা তাদের যৌবনে সন্তান জন্মদান ও লালনপালনে, কলকারখানায়, মাছ চাষে, পোশাক কারখানায়, বাড়িঘরে, কৃষিজমিতে, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নিজের ঘাম ঝরিয়ে রক্ত পানি করেছেন। দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবীণ নারীর এই অবদান আমরা স্বীকার করতে চাই না।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট সম্পদের মালিকানায় সবারই অধিকার থাকা উচিত। উপায়হীন প্রবীণ নারীকে পেছনে ফেলে রেখে উন্নয়ন করা অসম্ভব হবে। উন্নয়ন মানে অল্প কিছুসংখ্যক মানুষের আরামআয়েশ, ভোগবিলাস নয়। সব মানুষের সমমর্যাদায় একই সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া হলো উন্নয়ন। দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখা এই প্রবীণ নারীর দায়িত্ব কেবল পরিবারের সদস্যদের ওপর ন্যস্ত করা অমানবিক। এদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের।

হাসান আলী লেখক, গবেষক ও সংগঠক। সভাপতি, এজিং সাপোর্ট ফোরাম এবং ট্রেজারার, বাংলাদেশ জেরাটলজিক্যাল (বিজিএ) অ্যাসোসিয়েশন। hasanali63@gmail.com